Core-9

শেরশাহের শাসন সংস্কার

ভূমিকাঃ শেরশাহের আসল নাম ছিল ফরিদ । তিনি সম্ভবত ১৪৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা হাসান ছিলেন সাসারামের জায়গিরদার । ফরিদের বাল্যজীবন সুখের ছিল না । বিমাতার কোপে পড়ে তিনি সাসারাম ছাড়তে বাধ্য হন । পিতার মৃত্যুর পর তিনি সাসারামের জায়গিরদার রূপে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন । ১৫২২ সালে তিনি বিহারের শাসন কর্তার অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন । এই সময়ে তিনি সহস্তে তিনি একটি বাঘ মেরে শের খান উপাধি পান । কিন্তু তাঁর শত্রুরা তাকে সাসারাম ছাড়তে বাধ্য করেন । তখন তিনি বাবরের অধীনে চাকরি করেন । বাবরই তাকে সাসারাম ফিরিয়ে দেন ।

শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যঃ শের শাহের শাসনব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা । কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে কেন্দ্রীভুত থাকলেও তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না । প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল । শাসনের সুবিধার্থে তিনি সমস্ত রাজ্য ৪৭টি সরকারে ও প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত ছিল । শাসন কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরে ছিল গ্রাম । সরকারের শাসনভার ছিল শিকদার-ই-শিকদারানের উপর । প্রত্যেক পরগনায় একজন আমিন, শিকদার, একজন কোষাধ্যক্ষ ও হিসাবরক্ষক হিসাবে একজন হিন্দু ও একজন ফার্সি কর্মচারী থাকতেন । একজন মুনসিফ–ই–মুনসিফান পরগণার কর্মচারীদের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করতেন । সরকারি কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা ছিল ।

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা [Land-revenue policy]:- শের শাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা । ভুমি রাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষকের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন । তাঁর নিজের ভাষায় বলি- "আমি যদি কৃষকদের অত্যাচার করি, তাহলে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে এবং সমস্ত দেশ জনশূন্য ও ধ্বংস হয়ে যাবে"। প্রতিটি জমি যথাযত জরিপ করার পর খাজনা নির্ধারণ করা হত এবং তা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে নগদে বা শস্যে আদায় করা হত । রাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ । রাজস্ব আদায়ের জন্য আমিন, মুকাদ্দম, পাটোয়ারী কানুনগো প্রভৃতি কর্মচারীর সাহায্য নেওয়া হত । রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি ছিল । কিন্তু কোনো কারণে শস্যের ক্ষতি হলে কর ছাড়ের ব্যবস্থাও ছিল । সম্ভবত কৃষি ঋণের ব্যবস্থাও ছিল । জমিতে কৃষকদের অধিকারের স্বীকৃতি স্বরূপ কবুলিয়ত বা পাট্টার ব্যবস্থা ছিল । শের শাহের রাজস্ব ব্যবস্থার মূল লক্ষ ছিল সরকারের আর্থিক স্বাচ্ছল্য বিধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রজার স্বার্থ রক্ষা করা । শের শাহের রাজত্বকাল মাত্র ৫ বছর স্থায়ী হলেও শাসক হিসাবে তিনি অক্ষয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন । অনেকের মতে বিজেতা অপেক্ষা দক্ষ শাসক হিসাবেই শের শাহের রাজত্বকাল অধিক গুরুত্বপূর্ণ । ঐতিহাসিক কিনের মতে কোন সরকারই, এমনকি ব্রিটিশ সরকারও, শের শাহের মতো শাসন কার্যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন নি । ভিনসেন্ট স্মিথ, ডঃ কানুনগো, ঈশ্বরী প্রসাদ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও শের শাহের শাসন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । শের শাহের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে চিরাচরিত ভারতীয় শাসনের – তা সে হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক না কেন – বৈশিষ্ট্যও যেমন দেখা যায়, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

আর্থিক সংস্কার [Economic Reforms]:- রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের দিকেও শের শাহ লক্ষ রেখেছিলেন । তিনি মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করেন ও একটি বলিষ্ঠ শুল্কনীতি গ্রহণ করেন । পরিবহণের উন্নতির জন্য তিনি জি টি রোড সহ কয়েকটি বড়ো বড়ো রাস্তা নির্মাণ করেন । যাত্রীদের সুবিধার্থে রাস্তার ধারে ধারে বৃক্ষরোপণ করা হয় ও সরাইখানা নির্মাণ করা হয় । এই সরাইখানাগুলি আবার ডাকঘর ও সংবাদ আদান-প্রদানের কাজও করত ।

পুলিশ, বিচার ও সামরিক বিভাগ:- রাজ্যে সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখার জন্য পুলিশি ব্যবস্থাকে সংস্কার করা হয় । গ্রামে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ছিল গ্রাম প্রধানের হাতে । বিচারকার্যে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ করা হত না । পরগনায় বিচারের দায়িত্ব পালন করতেন আমিন, কাজী ও মির-ই-অদল । রাজধানীতে প্রধান কাজি বিচারকার্য সম্পাদন করতেন । বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল স্বয়ং সম্রাটের হাতে । সামরিক বিভাগকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি আলাউদ্দিনের পথ অনুসরণ করেন । তিনি একটি নিয়মিত বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন । প্রতিটি সৈনিক তাঁর প্রতি অনুগত ছিলেন এবং সেনাবাহিনীতে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করা হত । কোন প্রকার দুর্নীতি সহ্য করা হত না ।

কেন্দ্রীয় শাসনের বিভিন্ন বিভাগঃ শাসন ব্যবস্থায় সুবিধার জন্য তিনি শাসনব্যবস্থাকে বিভিন্ন দপ্তর ও পরহগনায় বিভক্ত করেন। যেমনঃ সামরিক, পররাষ্ট্র, অর্থ বিভাগ ইত্যাদি।

ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণঃ ইতিপূর্বে বাংলার ভৌগলিক সীমা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। মাহমুদ শাহের সময়ে বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গের এবং হাজীপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা বাংলার অধীনে ছিল। শেরশাহ এই অঞ্চলগুলো ভাগ করে বাংরার পশ্চিম সীমা তেলিয়াগড় পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাঃ শের শাহ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শিকদার নিয়োগ করেন। এরা ছিল সামরিক বাহিনীর লোক। এদের কাজ ছিল সুলতানের ফরমান জারি করা এবং সেই মোতাহের কাজ হচ্ছে কিনা তদারকি করা।

জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ফসল নষ্ট হলে তিনি রাজস্ব মওকুফ এবং কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করতেন। এক্ষেত্রে তিনি সুলতান আলাউদ্দিন খীলজীর রাজনীতি সম্প্রসারণ করেন।

শুল্ক নীতিঃ অর্থ ব্যবস্থায় গলদ উপস্থাপিত হলে যে, কত দূর্যোগ ঘটে তার দৃষ্টান্ত ইতিহাস বরাবরই মিলে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের যেন ক্ষতি না হয়। তাই তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তিত নির্দিষ্ট কিছু স্থান শুল্ক প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ সাম্ররাজ্যের নিরাপত্তা জনগণের সুবিধা, ব্যবসায়ীদের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার জন্য শেরশাহ্ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত ও নতুন সড়ক নির্মাণ করেন। এদের মধ্যে অন্যতম হল গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। এটি সোনাগাঁও থেকে সিন্ধু পর্যন্ত ৩০০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পরধর্ম সহিষ্ণঃ জনকল্যানের লক্ষ্যে তিনি জনগণকে ধর্মীয় গোড়ামি থেকে রক্ষা করেন। এককথায় বলা যায়, শেরশাহ্ ছিলেন পরধর্ম সহিষ্ণ তিনি হিন্দুরের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া তিনি এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেন। যারা ধর্মীয় অনুশাসনাদি আরোপ করতেন।

ডাক বিভাগঃ শেরশাহ ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তন করেন। এতে, সাম্ররাজ্যের এবং স্থান হতে অন্য স্থানে দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানে সুবিধা হয়।

কলা ও স্থাপত্য শিল্পঃ কলা ও স্থাপত্য শিল্পেও তার উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় । তিনি শিল্পনীয় যথেষ্ট সমদর করতেন। তাঁর আমলে পান্ডাতাবের রোটাল। দিল্লীর পুরানো কিল্লা, সাসারামে তাঁর সমাধি স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্যা।

শেরশাহের কৃতিত্ব:- মধ্যযুগের ইতিহাসে শের শাহ নিঃসন্দেহে একজন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য শাসক । সামান্য একজন জায়গিরদারের পুত্র হয়েও তিনি যেভাবে নিজ প্রতিভাবলে নবজাত মুঘল সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটিয়ে পাঠানদের পুনরাভ্যুত্থানের সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে । তাঁর সামরিক প্রতিভা উল্লেখযোগ্য হলেও ভারতের ইতিহাসে আমরা তাঁর থেকেও দক্ষ ও শক্তিশালী বীরের নাম হয়ত করতে পারি । কিন্তু আকবরের আগে মধ্যযুগের কোনো সুলতানই শাসক হিসাবে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না । বিশেষত যেভাবে তিনি স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে প্রজার বাৎসল্যের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, তার নজির নেই । পরবর্তী যুগে একমাত্র আকবরই তাঁর কৃতিত্বকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভুললে চলবে না যে, শের শাহের রাজত্বের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ৫ বছর এবং শের শাহের শাসন নীতির অনেক কিছুই আকবর গ্রহণ করেছিলেন। শের শাহের রাজনীতির প্রশংসা ঐতিহাসিক মাত্রেই করতে বাধ্য হয়েছেন । নির্মাতা ও শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সাসারামে নির্মিত তাঁর সমাধি আজও বিদ্যমান । সবশেষে শের শাহ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন । তাঁর সেনাপতি ব্রহ্মাজিৎ গৌড় ছিলেন একজন হিন্দু। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার যে দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন, তা মধ্যযুগের ইতিহাসে অতুলনীয় । ইউরোপে অষ্টাদশ শতকে যে কজন রাজা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও পরিশ্রম করতেন তাদের সালে শের শাহের তুলনা করা চলে। শেরশাহ্ নিঃসন্দেহে মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি তাঁর শুধু বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই ছিল না চেষ্টাও ছিল। তাঁর শাসনব্যবস্থা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।